সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৬ ॥ সংখ্যা : ১ ॥ কার্তিক ১৪২৬ ॥ অক্টোবর ২০১৮

https://doi.org/10.62328/sp.v56i1.7

বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে পরিবেশ

রত্না রানী দাস*

সারসংক্ষেপ :

উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য বৃক্ষরাজি-সমৃদ্ধ অনুকূল পরিবেশের আবশ্যকতা রয়েছে। মানুষ ও পরিবেশ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। মানুষের স্বেচ্ছাচারী আচরণের জন্য ভূপরিবেশ আজ বিপন্ন। পরিবেশকে সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক রাখা সকলের নৈতিক দায়িত্ব রূপে বিবেচিত হয়।

মহামতি বুদ্ধ নেপালের কপিলবাস্তুতে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধের জীবন ও দর্শনে মানবপ্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায়। বুদ্ধজীবনের সাথে পরিবেশের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবনযাপন করার শিক্ষা আমরা তাঁর জীবন ও উপদেশ থেকেও লাভ করি। এপ্রবন্ধে এসব বিষয় নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে।

ইংরেজিতে 'Environment'- শব্দটির বাংলা অর্থ 'পরিবেশ'। ফরাসি 'Environia' থেকে 'Environment' -শব্দটির উৎপত্তি। *'বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'*- গ্রন্থে এটির অর্থ করা হয়েছে এভাবে : 'চারপাশের অবস্থা, প্রতিবেশ, পরিমণ্ডল'।[১] 'Environment' বা 'পরিবেশ' শব্দটি যে কোনো জৈবিক সত্তার পরিবেষ্টনকারী প্রত্যেক উপাদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন সেই অবস্থাকে পরিবেশ বলে।[২] *'Oxford Advanced Learner's Dictionary'* -গ্রন্থে পরিবেশের ধারণা তুলে ধরা হযেছে এভাবে : 'The natural world in which people , animals and plants live'.[৩] মানবসভ্যতার ঊষালগ্নে পৃথিবী গাছপালা-সমৃদ্ধ ঘন বন-জঙ্গলে সমাকীর্ণ ছিল। সেই সবুজ বনবনাঞ্চল ছিল প্রাণীর বিচরণক্ষেত্র। মানুষ নানাভাবে পরিবেশের উপর বিরূপ আচরণ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। পরিবেশের সাথে বিরূপ আচরণ করে তারা নিজেরাই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে সমাজ ও সংস্কৃতিকে করে তুলছে বিপর্যস্ত। মানুষের স্বেচ্ছাচারী কাজের জন্য ভূ-পরিবেশ আজ বিপন্ন। সেই সাথে মানুষ আগামীর দিন নিয়ে শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। বলা যায়, পরিবেশ নিয়ে এখন সবাই আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। পরিবেশবিষয়ক ভাবনা নতুন কোনো বিষয় নয়। পৃথিবীর প্রাচীন সব

*প্রভাষক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সভ্যতা, সাহিত্য, ধর্মীয়গ্রন্থ, সমাজচিন্তা এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবনায় পরিবেশ বিভিন্নভাবে স্থানলাভ করে রয়েছে। মানুষ ও পরিবেশ একে-অপরের উপর নির্ভরশীল। একটু সহানভূতিই পারে উভয়েউভয়কে বিশাল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে তথা বাঁচাতে। কেবল অবৈরী ও প্রীতিময়ভাবই পারে উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব তৈরী করতে। উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক তথা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান না থাকলে কিংবা বৈপরীত্যমূলক মনোভাব থাকলে সভ্যতার বিলুপ্তিকে রোধ করার সাধ্য কারো নেই।

অনাদিকাল থেকে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে নিবিড়-গভীর সুসম্পর্ক বিদ্যমান। এখন নানারকম সমস্যায় জর্জরিত পরিবেশ। পরিবেশ তার চির চেনা-জানা আপনরূপ হারিয়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত মাটি-পানি-বাতাস দূষিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে অবিরত উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ বন ও পাহাড় কেটে এবং জলাশয় ভরাট করে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করছে। কলকারখানা তৈরী করছে। ময়লা-আবর্জনা ও বর্জ্য ফেলে নদ-নদী ও সমুদ্রের পানিকে দূষিত করছে। মানুষ তার নিজের সুখের আশায় জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামময় করে গড়ে তোলার জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন সম্পদকে নিজের মতো করে ব্যবহার করছে। এটি আমাদের জন্য সুখ-কল্যাণ বয়ে তো আনছেই না, বরঞ্চ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ[৪] সৃষ্টি করে দিচ্ছে। ফলে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আর পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। বর্তমান সময়ে পরিবেশবাদের কথা বলা হয়। এই পরিবেশবাদ হলো অখণ্ড মানবজাতির সুস্থ স্বাভাবিকভাবে, প্রকৃতির সাথে মমতাময় বন্ধুত্ব গড়ে তুলে। বেঁচে থাকার মতবাদ। সুতরাং পরিবেশকে সুস্থ, সুন্দর এবং স্বাভাবিক রাখা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আধুনিকতার করাল- গ্রাসে প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু প্রভাবিত হয়েছে তা নয়, মানবজীবনও প্রভাবিত হয়ে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামাজিক পরিবেশও একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেই হিসেবে পরিবেশ দুই ভাগে বিভক্ত : ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং খ. সামাজিক পরিবেশ।[৫] সামাজিক পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। বলা বাহুল্য, মানুষ স্বয়ং নিজে প্রকৃতির অবিভাজ্য অঙ্গ। তাই মানব অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে পরিবেশের দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য আমাদের লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

আজ থেকে ২৫০০ বছরেরও পূর্বে মহামতি বুদ্ধ বর্তমান নেপালের কপিলবাস্তুতে জন্মগ্রহণ করেন। 'বুদ্ধ'—শব্দের অর্থ 'মহাজ্ঞানী'। অর্থাৎ, যিনি সত্যকে উপলব্ধি করেন। মানবপ্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায় বুদ্ধের জীবন ও দর্শনে। গৌতম বুদ্ধ এক মৌলিক চিন্তাধারা প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তাধারার গতিপথ প্রদর্শন করেন।[৬] তিনি পরিবেশবিষয়ে সচেতন হবার পথপ্রদর্শন করেন। সবসময়ে তাঁর অনুসারীদের তিনি পরিবেশকে সংরক্ষণ তথা রক্ষা করার উপদেশ প্রদান করতেন।

পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে সুসম্পর্কের কথাও তাঁর উপদেশে রয়েছে।[৭] বুদ্ধের জীবনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে পরিবেশ। বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ, ধর্মচক্র প্রবর্তন এবং মহাপরিনির্বাণ এই চারটি অবিস্মরণীয় ঘটনা পরিবেশকে ঘিরেই সঙ্ঘটিত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন লুম্বিনী উদ্যানে[৮], ছয় বছর কঠোর সাধনা করেন গয়ার বোধিবৃক্ষ অর্থাৎ, অশ্বত্থ বৃক্ষের[৯] নিচে, পঞ্চবর্গীয়[১০] শিষ্যদের ধর্মচক্র প্রবর্তন বা ধর্মপ্রচার করেন বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে[১১]এবং মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন কুশিনারার যমক শালবৃক্ষের নিচে।[১২] এতে আমরা ধারণা করতে পারি যে বুদ্ধজীবনের সাথে পরিবেশের খুবই নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। এ যেন বুদ্ধের সাথে প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাঁর জন্ম লুম্বিনীতে। এ স্থান ছিল লতা-পাতা, গাছ-গাছালি ও গুল্মে ভরপুর। *'অম্বলট্ঠিকা'* আম্রপালির আম্রকানন জেতকুমারের 'জেতবন' পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজগৃহের সুরম্য ভূ-ভাগ বুদ্ধের নিবাস হিসেবে চিহ্নিত। প্রকৃতির কোলে জন্মগস্থহণ করার কারণে আজীবন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য গড়ে উঠেছিল। বুদ্ধের মহাজীবনকে যদি আমরা গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ কিংবা পর্যালোচনা করি, তবে আমরা দেখি : পরিবেশের (=প্রাকৃতিক পরিবেশের) সাথে তাঁর মধুর এবং গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। পরিবেশের (=প্রাকৃতিক পরিবেশের) সাথে খাপ খাইয়ে তথা মিল রেখে জীবনযাপন করার মধ্য দিয়ে তিনি সবাইকে পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা, সংরক্ষণ এবং গুরুত্ব সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করেন।

রাজপুত্র হলেও প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে তাঁর সুসমৃদ্ধ বন্ধনের কথা জানা যায়। একসময় হলকর্ষণ উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে তিনি জম্বুবৃক্ষের নিচে বসে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে রইলেন।[১৩] তিনি বুদ্ধত্ব লাভের পর সাত সপ্তাহ বোধিবৃক্ষের নীচে ধ্যান করে সপ্তমহাস্থানের[১৪] প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নিচে তার একটি ধারণা উপস্থাপন করা হলো। যথা :

প্রথম সপ্তাহ	তিনি নৈরঞ্জনা নদীর তীরস্থ বোধিবৃক্ষমূলে একাসনে ধ্যান পদ্মাসনে, বিমুক্তি- সুখের মাধ্যমে অতিবাহিত করেন।
দ্বিতীয় সপ্তাহ	তিনি বোধিলাভের আসন এবং অনিমেষ বৃক্ষকে স্মরণ করে একাসনে ধ্যান পদ্মাসনে অতিবাহিত করেন।
তৃতীয় সপ্তাহ	মণিচংক্রামণে চঙ্ক্রমণ করে অতিবাহিত করেন।
চতুর্থ সপ্তাহ	বোধিবৃক্ষের পার্শ্ববর্তী রত্নঘর চৈত্যে বসে তিনি কার্যকারণতত্ত্ব বা প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন।

পঞ্চম সপ্তাহ ⇒	অজপাল ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে একাসনে, ধ্যান পদ্মাসনে বিমুক্তিসুখ অনুভব করে অতিবাহিত করেন।
ষষ্ঠ সপ্তাহ ⇒	মুচলিন্দ বৃক্ষমূলে একাসনে, ধ্যান পদ্মাসনে বিমুক্তিসুখ অনুভব করে অতিবাহিত করেন। এই সময় ঝড়ো বাতাস, বৃষ্টি-বাদল শুরু হলে নাগরাজ বুদ্ধের দেহকে বেষ্টিত করে তাঁর শিরোপরি ফণা বিস্তৃত করে রইলেন।
সপ্তম সপ্তাহ ⇒	রাজায়তন বৃক্ষে বুদ্ধ সাতদিন একাগ্রচিত্তে একাসনে, ধ্যান পদ্মাসনে বিমুক্তি-সুখানুভব করে অতিবাহিত করেন।

সুজাতার পায়েস গ্রহণ করে তিনি বোধিবৃক্ষমূলে (=অশ্বত্থ-বৃক্ষমূলে) এসে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তারপর তিনি সারনাথের ঋষিপতন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মধ্যে ধর্মচক্র প্রর্বতন করেন এভাবে : হে ভিক্ষুগণ! 'তোমরা, বহুজনের হিতের জন্য এবং বহুজনের সুখের জন্য তোমরা দিকে দিকে বিচরণ কর। এমন ধর্মদেশনা কর যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যণ এবং অন্তে কল্যাণ।"[১৫] বর্ষাব্রতকে বুদ্ধের বিনয়বিধানের মধ্যে অগ্রে স্থান দেওয়া হয়। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বছর-ব্যাপী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে ধর্মবাণী প্রচার করেন। উল্লেখ থাকে যে তিনি ৪৫টি (পঁয়তাল্লিশ) বর্ষাবাসের মধ্যে ৩৬টি (ছত্রিশ) বর্ষাবাস লোকালয় থেকে দূরে নির্জন গভীর অরণ্যে প্রকৃতির কোলে লতা-গুল্ম ও গাছ-গাছড়ায় ঘেরা সবুজ উদ্যানে অবস্থিত বিহারে (Buddhist monastery) পালন করেন। তিনি যেসব বিহারে অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করেন তার একটি তালিকা নিচে উপস্থাপন[১৬] করা হলো। যথা :

১ম বর্ষাবাস	:	সারনাথের ঋষিপতন মৃগদাব বন
২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষাবাস	:	রাজগৃহের বেণুবন
৫ম বর্ষাবাস	:	বৈশালীর মহাবন
৬ষ্ঠ বর্ষাবাস	:	বর্তমানে ভারতের বিহাররাজ্যের মুকুল পর্বত
১০ম বর্ষাবাস	:	পারল্যেয় বন
১৩ তম বর্ষাবাস	:	বিহাররাজ্যের চালিয় পর্বত
১৪ তম বর্ষাবাস	:	শ্রাবস্তীর জেতবন
১৫ তম বর্ষাবাস	:	কপিলবাস্তুর ন্যগ্রোধারাম নামক রমণীয় উদ্যান
১৮-১৯ তম বর্ষাবাস	:	চালিয় পর্বত এবং
২১-৪৪ তম বর্ষাবাস	:	শ্রাবস্তীতে (বিশাখা প্রদত্ত পূর্বারামে) ৬ (ছয়) বর্ষাবাস এবং অবশিষ্ট বর্ষাবাস অনাথপিণ্ডিক জেতবনে।

বুদ্ধের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা কিংবা আচার-আচরণসহ প্রায় সমগ্র জীবন-দর্শনের সর্বত্রই প্রকৃতির সাথে নিরবচ্ছিন্ন গভীর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর সকল মহান কার্য সম্পাদিত হয় পরিবেশ ও প্রকৃতিকে ঘিরে। ধ্যানের জন্য বুদ্ধ উত্তম স্থান হিসেবে নির্জন ও গভীর ঘন-বনাঞ্চলকেই বেছে নেন। তাঁর বিচরণের স্থান হিসেবে বার বার বনাঞ্চল এবং পাহাড়-পর্বতের কথা উঠে আসে। বুদ্ধ তাঁর পঞ্চবর্গীয় শিষ্য, যশ, যশের চার বন্ধুসহ অপর ৫০ জন, ৩০ জন ভদ্রবর্গীয় গৃহীকে দীক্ষাদান, সারিপুত্র ও মহামৌদ্গালায়নের উপসম্পদা এবং রাজা বিম্বিসারের বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ সবই হয় প্রকৃতির কোলে।[১৭] ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের *'বুদ্ধবংশ'* গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ২৩ জন বুদ্ধের আবির্ভাবের কথা লিপিবদ্ধ আছে। তাঁরা সকলেই বৃক্ষমূলকেই ধ্যান-সাধনার উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বিভিন্ন বৃক্ষতলে তাঁরা সাধনা করে বোধিলাভ করেছিলেন। যথা : দীপঙ্কর বুদ্ধ শিরীষ বৃক্ষমূলে, কৌন্যি বুদ্ধ শালকল্যাণী বৃক্ষমূলে, মঙ্গল বুদ্ধ নাগেশ্বর বৃক্ষমূলে, সুমন বুদ্ধ জিননাগ বৃক্ষমূলে, রেবত বুদ্ধ নাগেশ্বর বৃক্ষমূলে, সোভিত বুদ্ধ নাগেশ্বর বৃক্ষমূলে, অনোমদর্শী বুদ্ধ অর্জুন বৃক্ষমূলে, পদুম বুদ্ধ মহাসোন (স্বর্ণ চাপা) বৃক্ষমূলে, নারদ বুদ্ধ মহাসোন (স্বর্ণ চাপা) বৃক্ষমূলে, পদুমুত্তর বুদ্ধ সলল বৃক্ষমূলে, সুমেধ বুদ্ধ মহানিম্ব বৃক্ষমূলে, সুজাত বুদ্ধ মহাবেণু বৃক্ষমূলে, প্রিয়দর্শী বুদ্ধ অর্জুন বৃক্ষমূলে, অর্থদর্শী বুদ্ধ চম্পক বৃক্ষমূলে, ধর্মদর্শী বুদ্ধ রক্তকরবী বৃক্ষমূলে, সিদ্ধার্থ বুদ্ধ কির্ণকার বা স্বর্ণালু বৃক্ষমূলে, তিস্স বুদ্ধ অসন বা পীতশাল বৃক্ষমূলে, ফুস্স বুদ্ধ আমলকী বৃক্ষমূলে, বিপস্সী বুদ্ধ অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে, শিখী বুদ্ধ পুণ্ডরীক বৃক্ষমূলে, বস্সভূ বুদ্ধ শাল বৃক্ষমূলে, ককুসন্ধ বুদ্ধ শিরীষ বৃক্ষমূলে, কোণাগমন বুদ্ধ উদুম্বর বা যজ্ঞডুমুর বৃক্ষমূলে, কাশ্যপ বুদ্ধ ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে এবং গৌতম বুদ্ধ অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বোধি লাভ করেন।[১৮]

বুদ্ধের সময়ে পরিবেশের (=প্রাকৃতিক পরিবেশের) কোনোরকম সমস্যা ছিল না কিংবা পরিবেশের উপর কখনো কারো আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের প্রভাব পড়তে দেখা যায় না। সেই সময় প্রকৃতির ভূ-ভাগকে দূষিত কিংবা নষ্ট করার কোনো রকম প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে ছিল না। আজ প্রাকৃতিক বির্পযয়ের কারণে নদ-নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন নদ-নদীর পানি দুর্গন্ধে দূষিত হচ্ছে। পাহাড়ে নিবাস গড়ে তোলার কারণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছকে কেটে ফেলা হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এভাবে বন-পাহাড়-পর্বতের উচ্ছেদে মানবসমাজে দেখা দেয় বিভিন্ন শঙ্কা।

দূষণসমস্যা পরিবেশের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। এই পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য বুদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন। তিনি বিনয় অনুশীলন ও প্রজ্ঞার আলোয় তাঁর শিষ্যদেরকে তৃণ-ঘাস-জলে মলমূত্র, থুথু ফেলে পানিকে দূষিত করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।[১৯] তিনি পরিবেশদূষণ রোধে খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি ভিক্ষুদেরকে,

যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা বিক্ষিপ্তভাবে না ফেলে, নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করেন।[২০] যেখানে - সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করার কারণে পরিবেশ দূষিত এবং দুর্গন্ধময় হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় তিনি যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ না করার বিধিনিষেধও আরোপ করেন। তিনি শৌচাগার থেকে যাতে দুর্গন্ধ বের হয়ে না আসে তার জন্য যথাযথ ঢাকনা ব্যবহার করার কথা বলেন। শুধু তাই নয়, তিনি মলমূত্র ত্যাগ করার স্থানকে কিভাবে তৈরী করতে হয়, সেবিষয়েও স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করেন। পরিবেশকে পরিশুদ্ধ রাখার জন্য বর্তমান সময়ে যেরূপ শৌচাগার ব্যবহার করা হয়, বুদ্ধ তৎকালে সেরূপ শৌচাগার সম্পর্কেও তাঁর শিষ্যদের অবহিত করেন।[২১]

বৃক্ষকে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপহার বলা হয়। বনজাত গাছপালার মাধ্যমে ভূমণ্ডলের পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য সংরক্ষণ করা হয়। বৃক্ষ প্রকৃতি ও পরিবেশের পরম বন্ধু। বুদ্ধ বৃক্ষকে সর্বপ্রথম এক 'জীববিশিষ্ট প্রাণী' বলে আখ্যায়িত করেন।[২২] বুদ্ধের সময় খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক। সুতরাং ইতঃপূর্বে আর কেউ বৃক্ষকে প্রাণী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি বা চিহ্নিত করেনি। পরবর্তী সময়ে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করলেন গাছের প্রাণের অস্তিত্বের কথা। বৃক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার ওষুধ তৈরী করা হয়, যা ত্রিপিটকের বিনয় পিটকের অর্ন্তগত মহাবর্গের ভৈষজ্য স্কন্ধে উল্লিখিত রয়েছে।[২৩] অধ্যায়টিতে ভিক্ষু-শ্রমণদের ব্যবহার্য ওষুধপত্রের বিধিনিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠার সময় বুদ্ধ ওষুধের জন্য হরীতকী, আমলকী, বহেড়া অনুমোদন করেন। এখানে তিনি ভিক্ষুদের বিভিন্ন রোগের জন্য বনজ তথা প্রাকৃতিক ঔষধের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং সেগুলোর সংরক্ষণের বিষয়ে তাগাদা দিয়েছেন। ভেষজবিশারদ জীবক ছিলেন বুদ্ধের চিকিৎসক। ভেষজজ্ঞান যাচাই করার জন্যে জীবককে একদিন তাঁর গুরু চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় না এমন গাছ নিয়ে আসার কথা বলেন। জীবক তাঁর গুরুর কথা মতো তক্ষশীলার চারদিকে বিচরণ করে চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুপযোগী কোনো গাছ-গাছালি, লতা-গুল্ম কিছুই দেখতে পাননি। বনের মধ্যে যে-সমস্ত গাছ-পালা ও লতা-পাতা-গুল্ম রয়েছে তার সবই ওষধি এবং সবই ভেষজ।[২৪] সুতরাং আমাদের জানতে হবে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাজি লতা-পাতা, ফলমূল আমাদের জীবনরক্ষাকারী ভেষজও বটে।

একসময় অরণ্যবিহারী ভিক্ষুরা নবকর্ম করার সময় নিজেরা বৃক্ষ ছেদন করেছেন এবং অন্যদের দিয়েও বৃক্ষ ছেদন করিয়েছেন। বিষয়টি সম্পর্কে বুদ্ধ অবগত হলে তিনি বৃক্ষ ছেদন বা বৃক্ষ নষ্ট না করার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করেন। উদ্ভিদ জাতীয় বৃক্ষ-লতাদি ছেদন করলে কিংবা নষ্ট করলে পাচিত্তিয়া (প্রায়শ্চিত্তিক) অপরাধ হয় বলে তিনি জানান।[২৫] তাই বুদ্ধ পাঁচ প্রকারের বৃক্ষকে নষ্ট কিংবা ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকার কথা বলেন।[২৬] বুদ্ধ বৃক্ষকে পাঁচ ভাগে বিভাজন করে দেখিয়েছেন।[২৭] যথা : মূলবীজ, স্কন্ধবীজ, ফলুবীজ, অগ্রবীজ এবং বীজবীজ।

- স্কন্ধবীজ : যে বৃক্ষ স্কন্ধ বা ডাল হতে উৎপন্ন বা অঙ্কুরিত হয়, তাকে বলা হয় স্কন্ধবীজ।
- ফলু বীজ : যে বৃক্ষ পর্ব বা কাণ্ডের গ্রন্থি হতে অঙ্কুরিত হয়, সেইগুলোকে বলা হয় ফলুবীজ।
- অগ্রবীজ : যে বৃক্ষ অগ্র বা শিকর হতে উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় অগ্রবীজ।
- বীজবীজ : যেগুলো বীজ হতে উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় বীজবীজ।

সকলের জ্ঞাতার্থে উপরি-উক্ত বীজসমূহের একটি ধারণা নিচে উপস্থাপন করা হলো।[২৮] যথা:

মূলবীজ	স্কন্ধ বীজ	ফলু বীজ	অগ্রবীজ	বীজবীজ
হরিদ্রা, আদা, বচা,[২৯] অতিবিষ,[৩০] কূটকরোহিণী উসরী [৩১], ভদ্রমুত্তক ইত্যাদি	অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ, পিলক্ষো[৩২], উরুম্বর[৩৩], কপিত্থনো[৩৪] ইত্যাদি	ইক্ষু, বাঁশ, নল ইত্যাদি	অজ্জুক[৩৫], হ্রীবের ইত্যাদি	আন, গম, মুগ ইত্যাদি

উপরি-উক্ত অনুজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত বনাঞ্চলের গাছ-পালা-লতা-গুল্মাদি ছেদন কিংবা নষ্ট করা থেকে বুদ্ধের নির্দেশনা ছিল। বনাঞ্চল থেকেই পরিবেশ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বনজ সম্পদ থাকার কারণেই পরিবেশ পরিপূর্ণতা লাভ করে। বুদ্ধ সবুজায়নকে রক্ষার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করেন। সবুজ ঘাস পশু-পাখিদের খাদ্য। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত ঘাসকে দূষিত না করা। অর্থাৎ, সবুজকে রক্ষা করা। ত্রিপিটকের অর্ন্তগত খুদ্দক নিকায়ের *'দীর্ঘ নিকায়'*- নামক গ্রন্থের *'কূটদন্ত সূত্রে'* দেখা যায় বুদ্ধের নির্দেশনায় রাজ কূটদন্ত কর্তৃক নানাবিধ প্রাণীর জীবন নষ্ট হল না। যূপকাষ্ঠের জন্য কোনো বৃক্ষকে ছেদন করতে হলো না।[৩৬] তাছাড়া দীর্ঘ নিকায় গ্রন্থের *'চক্রবর্তী সিংহনাদ সূত্রে'* রাজার অনেকগুলো গুণাবলীর কথা তুলে ধরা হয়, যেখানে অষ্টম গুণটি হলো পশু-পাখিদের হত্যা না করে তাদের রক্ষা করা।[৩৭]

বুদ্ধ ভিক্ষুদের পরিস্রাবিত পানি পান করার জন্য বলেন। অর্থাৎ, অপরিস্রাবিত পানি পান না করার জন্য বিধি-নিষেধ আরোপ করেন।[৩৮] মূলতঃ এরূপ নিয়মগুলো প্রবর্তিত হয়েছিল ভিক্ষুদের কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করা থেকে বিরত রাখার জন্যে। উপরিউক্ত বিধান অনুসারে যদি কোনো ভিক্ষু কীট-পতঙ্গযুক্ত পানি পান করেন, তবে তিনি পাচিত্তিয়া

অপরাধেও অপরাধী হবেন।[৩৯] সাধারণ অর্থে 'পাচিত্তিয়া' বলতে প্রায়শ্চিত্তিক, দুঃখ প্রকাশ, দোষ স্বীকার ইত্যাদি বোঝায়। যা কুশল ধর্মকে পাত করে বা পরমার্থ লাভের অন্তরায়কর হয়, তাকে পাচিত্তিয়া বলে। বলা যায়, উপরি-উক্ত নির্দেশনায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়াও সমস্ত প্রাণীর প্রতি করুণাভাবও প্রদর্শন করা হয়। বৌদ্ধধর্মে সর্ব প্রকার দণ্ড দান বর্জন করে সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব প্রদর্শন করা হয়। *'মৈত্রীসূত্রে'* উল্লেখ রয়েছে : পৃথিবীতে যত প্রাণী রয়েছে সকলে সুখী হোক।[৪০] পশুদের কীভাবে রক্ষা করা দরকার তার একটি ধারণা *'নন্দিবিশাল জাতকে'* দেখা যায়।[৪১] বলা বাহুল্য, বুদ্ধ মৈত্রীকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। মৈত্রী দ্বারা বনের পশুদের পোষ মানানো সম্ভব। যখন বুদ্ধ পারিলয্য বনে একাকী বসবাস করতেন তখন নালাগিরি নামক একটি হস্তী তাঁর দেখাশোনা করেন।[৪২] *'খুল্লহংস জাতকে'* দেখা যায় যে একসময় বুদ্ধকে দেবদত্ত প্রাণনাশের জন্য একটি হস্তী প্রেরণ করলে বুদ্ধ সেই হস্তীকে মৈত্রী দ্বারা পোষ মানিয়েছিলেন।[৪৩] *'মচ্ছুদান'* জাতক হতে জানা যায় যে, বোধিসত্ত্ব তাঁর অবশিষ্ট খাদ্য মাছের জন্য নদীতে নিক্ষেপ করতেন।[৪৪] *'উম্মাদয়ন্তি জাতকে'* দেখা যায়, ক্ষত্রিয় রাজা পশু-পাখিদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ ছিল।[৪৫]

সূত্র পিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ের *'রুক্খ সুত্তে'* অর্থাৎ, 'বৃক্ষ সূত্রে' চার প্রকার বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বৃক্ষের মাধ্যমে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা হয়।[৪৬]

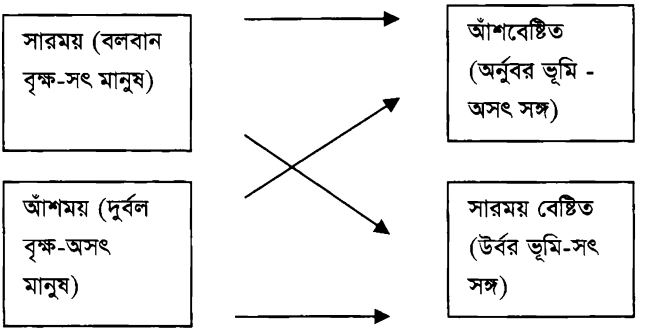

এখানে উপরি-উক্ত চার রকমের বৃক্ষের সাথে বুদ্ধ চার প্রকার মানবের অস্তিত্বের কথা তুলে ধরেন, যা আমাদের সমাজে বিদ্যমান। উর্বরভূমিতে যেমন ফসলাদি ভালো হয়, তেমনিভাবে সৎ মানুষের জীবনও সুন্দর হয়ে উঠে। তেমনি করে বলাহক (ঘনকালো মেঘ) সূত্র[৪৭] হ্রদ সূত্র[৪৮] আম্র সূত্র[৪৯], মূষিক (ইঁদুর) সূত্র[৫০], ষাঁড় সূত্র[৫১] প্রভৃতি সূত্রের মাঝে বুদ্ধের দেয়া প্রকৃতিসম্পর্কিত অনেক উদাহরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 'প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি' বা 'কার্য-কারণ-নীতি' বৌদ্ধদর্শনের মূল চাবিকাঠি, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Dependent Origination'। এই নীতি দ্বারা সংসারের দুঃখ-দুর্দশার আদিকারণসমূহ দেখানো হয়েছে। আরো দেখানো হয়েছে দুঃখের এই কারণসমূহ নিঃশেষে অপসৃত হলে ভবিষ্যতে আর দুঃখের উৎপত্তি হবে না। বুদ্ধ কর্তৃক আবিষ্কৃত চারটি মহাসত্যসহ[৫২] ও অপর সব মতবাদই এই দার্শনিক তত্ত্বের উপর

প্রতিষ্ঠিত। তত্ত্বটির মতে, প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে একটি কারণ নিহিত থাকে। বিপরীতধর্মী কাজের ফলাফলও বিপরীত হয়। এটি শুধু মানবসমাজের জন্য নয়, প্রকৃতি-পরিবেশ, গ্রহ, নক্ষত্রসহ সর্বক্ষেত্রে এটি চিরন্তন সত্য। নিচে *'অধার্মিক সূত্র'*-এর আলোকে পরিবেশ দূষণের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে একট চিত্র উপস্থাপন করা হলো।[৫৩]

প্রশাসক অধার্মিক হলে নিম্নস্তরের উপ-প্রশাসকও অধার্মিক হয়

↓

উপ-প্রশাসকও অধার্মিক হবার কারণে গৃহপতিরাও অধার্মিক হয়

↓

গৃহপতিরাও অধার্মিক হবার কারণে নিগম-জনপদবাসী অধার্মিক হয়

↓

নিগম-জনপদবাসী অধার্মিক হবার কারণে চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে না

↓

চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ না করার কারণে নক্ষত্র-তারকাদিও নিজস্ব কক্ষপথে

↓

নক্ষত্র-তারকাদিও নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ না করার কারণে সঠিক সময়ে দিন-রাত

↓

সঠিক সময়ে দিন-রাত না হবার কারণে সঠিক সময়ে পক্ষ মাস হয় না

↓

সঠিক সময়ে পক্ষ মাস না হবার কারণে সঠিক সময়ে ঋতু-বছর হয় না

↓

সঠিক সময়ে ঋতু-বছর না হবার কারণে অসময়ে-অনিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়

↓

অসময়ে-অনিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হবার কারণে দেবতারা কুপিত হয়

↓

দেবতারা কুপিত হবার কারণে যথাসময়ে বৃষ্টি হয় না।

↓

যথাসময়ে বৃষ্টি না হবার কারণে অল্প সময়ে শস্য পরিপক্ব হয়

↓

অল্প সময়ে পরিপক্ব শস্য পরিভোগ করার কারণে মানুষ অল্পায়ু ও বহু রোগে আক্রান্ত হয়

উপরি-উক্ত সারণী-অনুসারে বৌদ্ধদর্শনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ সম্পাদন করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ করা সম্পর্কে একটি ধারণা অবগত হওয়া যায় ।

ত্রিপিটকের জাতকসাহিত্যসমূহ শুধু পালি সাহিত্যে কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্যসম্পদ। অর্থাৎ, গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের বিচিত্র কাহিনিগুলো জাতকাকারে লিপিবদ্ধ। গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের পূর্বজন্মের কাহিনি *'জাতক'*-গ্রন্থে সন্নিবেশিত রয়েছে। পালিসাহিত্যে দেখা যায় : বুদ্ধ দশটি পারমী[৫৪] ত্রিধারায়[৫৫] পূর্ণ করে অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করেন। পারমী পূর্ণকালীন সময়ে মহামানব গৌতম বুদ্ধ বিভিন্ন কূলে জন্মগ্রহণ করে এক একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। কখনো তিনি বণিক, শ্রেষ্ঠী কুলে, রাজপুত্র, রাজা, ব্রাহ্মণ, প্রাণী কুলে, অমাত্য, রাজপুরোহিত, জমিদার, ধনী কুলে, বৃক্ষদেবতা প্রভৃতি রূপে জন্মগ্রহণ করেন। জাতক-কাহিনিতে দেখা যায় : বৃক্ষদেবতা রূপে তিনি ৩০ বার জন্ম নেন। জাতকগুলো নিম্নরূপ :

- কণ্ডিন মৃগ জাতক, মৃতক ভক্ত জাতক, আয়াচিত ভক্ত জাতক, বক জাতক, বৃক্ষধর্ম জাতক, পর্ণিক জাতক, দুব্বল কাষ্ঠ জাতক, কুণ্ডকপূপ জাতক, শৃগাল জাতক, উভতোভ্রষ্ট জাতক।[৫৬]
- চতুমৃষ্ট জাতক, গাঙ্গেয় জাতক, কক্কর জাতক, সেগৃগু জাতক, গ্রোথ প্রাণ জাতক, বাঘ জাতক, বদ্ধকি শূকর জাতক, জম্বু খাদক জাতক, অন্ত জাতক, উড়ুম্বর জাতক।[৫৭]
- পলাশ জাতক, পিচুমন্দ জাতক, বর্ণারোহ জাতক, দণ্ডপুষ্প জাতক, কোটিশাল্মলি জাতক, সুলসা জাতক, পুতিমাংস জাতক।[৫৮]
- স্পন্দন জাতক এবং তক্ষকশূকর জাতক।[৫৯]
- গণ্ডতিন্দু [৬০]

বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভের পর বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ করে ধর্মবাণী প্রচার করেন, যা আমরা পিটকীয় অনেক গ্রন্থের মধ্যে দেখতে পাই। এ সময় তিনি নির্জন ও গভীর বনে নির্মিত বিহারে অবস্থান করে ধ্যান-সমাধি এবং সকলকে উপদেশ প্রদান করতেন। বুদ্ধের সময়েও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের প্রবণতা দেখা যায়। ধ্যান (Meditation)-এর জন্য বন ও শান্তপরিবেশ উত্তম। বিভিন্ন রাজা ও শ্রেষ্ঠিগণ নানা বিহার ও আবাস নির্মাণ করেছিলেন ছায়াঘেরা নির্জন বন-বনাঞ্চলে। তিনি যে সমস্ত বিহারে অবস্থান করেন, তার একটি ধারণা উপস্থাপন করা হলো।

- রাজগৃহে জীবক কৌমারভৃত্যের আম্রবণ।[৬১]
- নালন্দায় পাবারিকের আম্রবণ।[৬২]
- অম্বপালির আম্রবণ।[৬৩]

- হিরণ্যবতী নদীর অপর পার্শ্বস্থিত কুশিনারার উপবর্তন মল্লদিগের শালবন ।[৬৪]
- মোরিয়গণের পিপফল বন ।[৬৫]
- সেতব্যার উত্তরে স্থিত শিংশপা বন ।[৬৬]
- আকাঙ্ক্ষণীয় সূত্রে একসময় ভগবান শ্রাবস্তী নিকটে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করেছিলেন ।[৬৭]
- বনপ্রস্থ সূত্রে একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর নিকটে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করেছিলেন ।[৬৮]
- রথবিনীত সূত্রে একসময় ভগবান রাজগৃহের নিকটে বেণুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করেছিলেন ।[৬৯]
- ক্ষুদ্র-গোশৃঙ্গ-সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে যে একসময় ভগবান নাদিকে এক ইষ্টকনির্মিত গৃহে অবস্থান করছিলেন । সেই সময় আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধ, নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান্ কিম্বিল গোশৃঙ্গ শালবন 'দাবে' (=অরণ্যে) অবস্থান করেছিলেন ।[৭০]
- মহাগোশৃঙ্গ-সূত্রে একসময় ভগবান গোশৃঙ্গ শালবন দাবে (=অরণ্যে) অবস্থান করেছিলেন ।[৭১]
- মহাসত্যক সূত্রে একসময় ভগবান বৈশালী সমীপে মহাবনে কূটাগারালয়ে অবস্থান করেছিলেন ।[৭২]
- মারতর্জন সূত্রে একসময় ভগবান ভেসকলাবন মৃগদাবে অবস্থান করছিলেন ।[৭৩]
- জীবক সূত্রে ভগবান রাজগৃহ সমীপে কোমারভচ্চ জীবকের আম্রবণে অবস্থান করছিলেন ।[৭৪]
- উপালী সূত্রে উল্লেখ আছে দণ্ডকারণ্য, কালিঙ্গারণ্য, মেধ্যারণ্য ও মাতঙ্গারণ্য এই চারি অরণ্য মহারণ্যে পরিণত হয়েছে ।[৭৫]
- চাতুম সূত্রে বুদ্ধ চাতুমায় আমলকী বনে বিহার করছিলেন ।[৭৬]
- নলকপান সূত্রে ভগবান কোশলপ্রদেশে, নলকপানের পলাশবনে, বাস করেছিলেন ।[৭৭]
- মাগন্দিয় সূত্রে বুদ্ধ তখন কুরুজাঙ্গলে অবস্থান করছিলেন ।[৭৮]
- মখাদেব সূত্রে বুদ্ধ মিথিলার মখাদেব আম্রবণে অবস্থান করছিলেন ।[৭৯]
- মধুর সূত্রে উল্লেখ আছে বুদ্ধ সেইসময় মথুরায় গুন্দাবনে অবস্থান করেছিলেন ।[৮০]
- কিন্তি সূত্রে সেইসময় বুদ্ধ কুশীনগর সমীপে বলিহরণ বনখণ্ডে অবস্থান করেছিলেন ।[৮১]

বর্তমান সময়ে শব্দদূষণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে । শব্দদূষণের ফলে শ্রবণেন্দ্রিয় ছিদ্র হয়ে যায় । লোকে কানে কম শোনে । ফলে মানসিকভাবে চাপে থাকে । মন-মানসিকতা

খিটখিটে হয়ে যায়। বুদ্ধ উচ্চ ও জোরে জোরে গীত-গান-বাজনার শব্দ থেকে বিরত থাকতেন। তিনি কোলাহলের বিরুদ্ধে ছিলেন।[৮২] একসময় বুদ্ধ কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি না করে অবস্থান করার অনুজ্ঞা প্রদান করেছিলেন।[৮৩] নির্মল বায়ু আমাদের জীবনের অন্যতম উপাদান। বায়ু থেকেই আমরা প্রতিনিয়ত শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকি। নির্মল বাতাসে আমরা আনন্দিত হই। আবার দুর্গন্ধযুক্ত বাতাসে আমাদের মন-প্রাণ বিষাদগ্রস্ত হয়। বুদ্ধ নির্মল ও বিশুদ্ধ বায়ু পছন্দ করতেন। বুদ্ধ তাঁর গৃহত্যাগের পর উরুবেলায় উপস্থিত হোন। তিনি নৈরঞ্জনা নদীর সুরম্য তীর এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে প্রীতিলাভ করেন। তারপর তিনি নৈরঞ্জনা নদীর তীরকে সমাধি লাভের জন্য খুবই উপযুক্ত মনে করেন। স্থানটির ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেছেন : এই স্থান অতীব মনোরম এবং মনোময়। নদীর তীরাঞ্চল সমুজ্জ্বল এবং মনোরম। নদীর স্বচ্ছ জলধারা কলকল শব্দে প্রবাহিত। আর পাখির চির-চেনা ডাক অঞ্চলকে করে তোলে মুখরিত। নদীর তীরের পাশে ছিল গ্রাম, যেখানে ভিক্ষান্ন লাভ করা সহজ। এজন্য স্থানটি ধ্যান-সমাধির জন্য উপযুক্ত বলে তিনি মনে করেন।[৮৪] বুদ্ধ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বন, জঙ্গল, পর্বতসহ সুরম্য নদীর তীরে এবং পুকুরের সমীপবর্তী স্থানে অবস্থান করতেন। তিনি যে বিহারে অবস্থান করতেন ওই বিহারএলাকায় থাকতো নানা প্রজাতির গাছপালা।

প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে মানুষের নিবিড় এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিরাজমান। বুদ্ধ যখন ধর্মবাণী প্রচার করেন, তখন তিনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির বহুবিধ উদাহরণ উপমায় এনে তাঁর উপদেশে তুলে ধরেন। মানুষ সচরাচর তৃষ্ণায় আবদ্ধ। প্রতিনিয়ত আমরা তৃষ্ণাজালে আবদ্ধ হচ্ছি। মানুষ তৃষ্ণাকে দৃঢ়তার সাথে দমন করতে না পারলে মানবজীবনে দুঃখ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ, বৃক্ষের মূলোৎপাটন না হলে যেমন পুনরায় গজিয়ে উঠে। বুদ্ধ বৃক্ষরাজির সাথে মানবজীবনের তুলনা করেছেন এভাবে : মূল অনুৎপাটিত ও দৃঢ় থাকলে যেমন ছিন্ন গাছও আবার গজিয়ে ওঠে, অনুরূপভাবে তৃষ্ণার মূল ছিন্ন না হলে দুঃখ বার বার উৎপন্ন হবে।[৮৫] তৃষ্ণার ক্রমবর্ধমান ভাবকে প্রাকৃতিক পরিবেশের গাছ-পালা ও লতা-গুল্মের সাথে তুলনা করে বুদ্ধ বলেন : তৃষ্ণাস্রোত সর্বত্রই প্রবাহিত হয়। আর তৃষ্ণালতা অঙ্কুরিত হয়ে থাকে। তৃষ্ণালতাকে অঙ্কুরিত হতে দেখলেই প্রজ্ঞাবলে জ্ঞানী লোকেরা তার মূলোৎপাটন করে।[৮৬]

বর্তমান সময়েও পরিবেশবাদীরা বনাঞ্চল সৃষ্টি ও নানা উপায়ে তা রক্ষায় ব্যবস্থাগ্রহণের উপর খুবই জোর প্রদান করেন। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার চিন্তা-চেতনা কিংবা ধ্যান-ধারণা বুদ্ধের সময়েও যেমন ছিল, পরবর্তী বিভিন্ন বৌদ্ধ রাজাদের সময়েও তা তেমনি লক্ষ করা যায়। এখানে দেখা যায় : সম্রাট অশোক বন-জঙ্গল রক্ষা কিংবা সংরক্ষণের উপর খুবই গুরুত্বারোপ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান কিংবা তথ্য-প্রযুক্তিময় বিশ্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। অথচ খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক পরিবেশসংরক্ষণ কিংবা জীববৈচিত্র্য রক্ষার প্রয়োজনীতা গভীরভাবে উপলব্ধি করে এক আদেশ জারি করেন।[৮৭] সে সময়টি ছিল,

এতদঞ্চলে, পরিবেশসংরক্ষণের স্বর্ণযুগ। অশোক মানুষ ও পশুদের ছায়া প্রদান করার জন্য রাস্তার দুই ধারে বটবৃক্ষ এবং আমগাছের বাটিকা রোপণ করিয়েছিলেন।[৮৮] যেখানে মানুষ এবং পশুর উপযোগী কোনো ভেষজ ছিল না, সেখানে তিনি তরু-লতা-গুল্ম রোপণ করান। আবার যেখানে কোনো ফলমূল ছিল না, সেখানে তিনি তা বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এনে রোপণ করান।[৮৯] সম্রাট মানুষ ও পশুদের বিশ্রামের জন্যে বিশ্রামাগার নির্মাণ করেন। তাছাড়া তিনি পাশাপাশি তাদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করারও ব্যবস্থা করেন।[৯০] সম্রাট অশোক, বছরের নির্দিষ্ট দিনে, মাছ ধরাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং হাতীর জন্য অভয়ারণ্যেরও ব্যবস্থা করেন।[৯১] পরিবেশকে সংক্ষরণ করার ক্ষেত্রে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনি তাঁর এক অনুশাসনে বনাঞ্চলকে নষ্ট কিংবা পোড়ানো যাবে না বলে এক বিধান জারি করেন। আগেই বলেছি, বুদ্ধ বৃক্ষকে এক 'ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রাণী' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বুদ্ধের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষের পাশাপাশি পরিবেশকে আপন করে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বহু ব্যবস্থাও তিনি, আন্তরিকতার সাথে, গ্রহণ করেন।

পরিবেশসংরক্ষণ কিংবা জীব-বৈচিত্র্যময়তা বৃদ্ধিকরণে সম্রাট অশোকের প্রাণী সংরক্ষণপদ্ধতি খুবই প্রশংসার দাবীদার। তিনি যে-সমস্ত প্রাণী সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তার একটি তালিকা[৯২] নিচে তুলে ধরা হলো। যথা :

- ❖ Parrots (শুকজাতীয় পাখি)
- ❖ Starlings (এক জাতীয় পাখি)
- ❖ Adjutants (হাড়গিলা পাখি)
- ❖ Brahmany ducks (একপ্রকার হাঁস)
- ❖ Geeses (রাজহাঁস)
- ❖ Nandimukhas (জলচর একপ্রকার পাখি)
- ❖ Bats-Queen (রানি পিপীলিকা)
- ❖ Female tortoise (মা - কচ্ছপ)
- ❖ Boneless fish (চিংড়িজাতীয় মাছ)
- ❖ Vedaveyakas (একপ্রকার মাছ)
- ❖ Gangapuputakas (একধরনের মাছ)
- ❖ Skate (সামুদ্রিক বৃহদাকার মাছ)
- ❖ River tortoise (নদীর বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ)
- ❖ Procupine (গণ্ডার)
- ❖ Tree squirrels (কাঠবিড়ালী)
- ❖ Barahsingha stags (একপ্রকার হরিণ)

- ❖ Brahmany bulls (একপ্রকার ষাঁড়)
- ❖ Monkeys (বিভিন্ন প্রজাতির বানর)
- ❖ Rhinoceros (গণ্ডার)
- ❖ Grey doves (শ্বেত কপোত)
- ❖ Pigeons (বিভিন্ন প্রজাতির পায়রা)
- ❖ All four footed animals (সকল প্রকার চতুষ্পদী প্রাণী)

বুদ্ধের জীবদ্দশায় ধনবান অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা, রাজা বিম্বিসার, রাজা প্রসেনজিৎ প্রমুখ রাজন্যবর্গ বুদ্ধকে, তাঁর মহান ভিক্ষু-সঙ্ঘের জন্য, বিহারনির্মাণ করে দান করেন। এই বিহার শুধু বিহার নয়; এখানে আছে সভার স্থান, প্রার্থনা করার স্থান, চঙ্ক্রমণ করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা, পুকুর, পানীয় জলের কূপ। অধিকন্তু বিহারের চারপাশে নানারকম গাছপালা ছিল। প্রার্থনাস্থলের সামনে বৈচিত্র্যময় নানা প্রজাতির ফুলের গাছ রোপণ করার প্রবণতা সেই সময়ও লক্ষ্য করা যায়।[৯৩] তখন প্রকৃতিতে উৎপন্ন গাছপালা, লতা-গুল্ম, মূল, বাকল, ফলমূল ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষ গড়ে তুলেছে তার পরিবেশ। বলা যায়, পরিবেশই প্রাণীর ধারক ও বাহক। মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের একমাত্র অবলম্বন হলো পরিবেশ। বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে পরিবেশ-সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বুদ্ধের জীবনের সাথে পরিবেশের এক ঘনিষ্ঠ, অনবদ্য ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা বৌদ্ধধর্মের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে, ধর্মের প্রচার-প্রসারসহ প্রায় সকল মহান ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল প্রকৃতি ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতির সকল উপাদান রক্ষা করার প্রতি ছিল বুদ্ধের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি। যেহেতু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন : বৃক্ষ শুধু নৈসর্গিক শোভা নয়, মানুষের যাপিতজীবনের অপরিহার্য অংশবিশেষ।

মানবজীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশরক্ষায় অসাধারণ ভূমিকা পালন করে বৃক্ষরাজি। এমতাবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেশের বির্পযয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। বনাঞ্চল সৃষ্টি করতে হবে। সবশেষে বলা যায় : যারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পরিবেশ নষ্ট করছে কিংবা বিভিন্ন উপায়ে পরিবেশদূষণে যুক্ত হচ্ছে, তাদের আরো বেশি সচেতন হওয়া দরকার।

তথ্যনির্দেশিকা

১. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ (ঢাকা : ২০১৪ বাংলা একাডেমী), পৃ. ৭২৭।
২. সুব্রতকুমার সাহা, *পরিবেশবিজ্ঞান*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা:২০০৭, বাংলা একাডেমী), পৃ. ১।

৩. *Oxford Advanced Learne's Dictionary*, Sixrh edition (Oxford : 2000, Oxford University Press), P. 421.
৪. ধস, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি Savindra Singh, Environmental Geography, Revised Edition (Allahabad: 2004, Prayag Pustak Bhawan, P. 357.
৫. পরিবেশবিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; Savindra Singh, Environmental Geography, Revised Edition (Allahabad: 2004, Prayag Pustak Bhawan, P. 357.
৬. সোলায়মান আলী সরকার, *ভারতের দর্শনপরিচিতি* (ঢাকা: ২০০৪, বাংলা একাডেমী), পৃ. ৬২।
৭. অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড (রাঙ্গামাটি: বনভান্তে প্রকাশনী), পৃ. ৭৪।
৮. Narada Maha Thera, *Buddha and His Teaching* (Taiwan : The Corporate Body of the Buddha Educationa Foundation), P. 1.
৯. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, তাইওয়ান: সন অনুল্লেখিত, করপর্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), পৃ. ১।
১০. পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা হলেন : কৌণ্ডিন্য, বপ্প, ভদ্রিয়, মহানাম এবং অশ্বজিৎ।
১১. *মহাবর্গ*, প্রাগুক্ত. পৃ, ১০-১১।
১২. রাজগুরু ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *মহাপরিনিব্বানং সূত্ত* (তাইওয়ান: সন অনুল্লেখিত, করপর্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), পৃ. ১৬৯।
১৩. অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া, *মহামানব বুদ্ধ*, দ্বিতীয় সংস্করণ (চট্টগ্রাম:১৯৮৫) পৃ. ২৮।
১৪. সপ্ত মহাস্থান হলো :
পঠমং বোধি পাল্লঙ্কং দুতিয়ং অনিমিসম্পি চ
ততিয়ং চঙ্কমণং সেট্ঠং চতুত্থং রতনঘরং
পঞ্চমং অজপালঞ্চ মুচলিন্দঞ্চ ছট্ঠমং
সত্তমং রাজায়াতন বন্দেতং বোধিপাদপং। মহাবর্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৮ ।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৮।
১৬. *মহাপরিনিব্বানং সূত্ত* , প্রাগুক্ত,পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
১৭. মহাবর্গ, গ্রাগুক্ত, পৃ. ১৪, ১৬, ১৯, ২১, ২৪ ৩৭, ৪১।
১৮. পবিত্র ত্রিপিটক, খণ্ড ১২, *বুদ্ধ বংশ* (খাগড়াছড়ি : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), পৃ. ৫৫৩, ৫৫৬, ৫৫৮, ৫৬০, ৫৬২, ৫৬৪, ৫৬৬, ৫৬৮, ৫৭০, ৫৭৩, ৫৭৫, ৫৭৭, ৫৭৯, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৬, ৫৮৮, ৫৮৮, ৫৯২, ৫৯৪, ৫৯৬, ৫৯৮, ৬০০, ৬০২।
১৯. বিনয়াচার্য ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাথের, *চূল্লবর্গ* (রাঙ্গামটি:২০০৩, বনভান্তে প্রকাশনী), পৃ. ৩৭৮-৩৮১।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০-৩৮৩।
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯-৩৮০।
২২. *মহাবর্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।
২৫. ভূতগামপাতব্রয পাচিতিয়'ন্তি। ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু অনূদিত, *বিনয় পিটকে পাচিত্তিয়া*, দ্বিতীয় প্রকাশ (চট্টগ্রাম : ২০০৭, সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা), পৃ. ৬৮ ।

২৬. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, *দীর্ঘ নিকায়*, প্রথম খণ্ড (পূর্ব পাকিস্তান: ১৯৬২, রাজানগর, রাঙ্গুনীয়া), পৃ. ৬।
২৭. *বিনয় পিটকে পাচিত্তিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
২৯. এক জাতীয় সুগন্ধ জাতীয় ওষুধি গাছ।
৩০. এক জাতীয় ওষুধি গাছ।
৩১. এক জাতীয় জালি গাছ ।
৩২. এক জাতীয় ডুমুর গাছ ।
৩৩. এক জাতীয় ডুমুর গাছ।
৩৪. এক জাতীয় বন্য ফল।
৩৫. এক জাতীয় তুলসী গাছ।
৩৬. দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।
৩৭. ভিক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : ২০০৭, সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা), পৃ. ৫২।
৩৮. *বিনয় পিটকে পাচিত্তিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪ ।
৩৯. *বিনয় পিটকে পাচিত্তিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪ ।
৪০. শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, *সুত্ত নিপাত* (রাঙ্গামটি: ২০০৭), পৃ. ৭৪।
৪১. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ(কলিকাতা: ১৩৮৪, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ৬১-৬২।
৪২. *মহাবর্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫।
৪৩. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলিকাতা : ১৩৯৮, করুণা প্রকাশনী), পৃ.২০৭-২০৯।
৪৪. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলিকাতা : ১৩৮৪, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ৭৪-৭৫।
৪৫. *জাতক*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।
৪৬. অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড চতুর্থ নিপাত, দ্বিতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : ২০১২) পৃ. ১০৯।
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।
৫২. *মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
৫৩. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।
৫৪. দশ পারমীসমূহ হলো : দান, শীল, নৈষ্কম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, মৈত্রী, সত্য, অধিষ্ঠান এবং উপেক্ষা।
৫৫. যথা : পারমী, উপ-পারমী এবং পরমার্থ পারমী।
৫৬. *জাতক*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮, ৪৫, ৪৭, ৮০, ১৫৪, ২০৭, ২০৯, ২১৪, ২১৬, ২৫৪।

৫৭. *জাতক*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ৬৭, ৯৫, ১০২, ১১৩, ১৩২, ২২৩, ২৫২, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৮।
৫৮. শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী), পৃ. ১৫, ২১, ১১৪, ১৯০, ২২৬, ২৪৭,৩০১।
৫৯. শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, চতুর্থ খণ্ড (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী), পৃ. ১৪৩, ২৩২।
৬০. *জাতক*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
৬১. *দীর্ঘ নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।
৬৩. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা :১৯৫৪, মহাবোধি সোসাইটি), পৃ. ৮৬।
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।
৬৭. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড (তাইওয়ান: সন অনুল্লিখিত, করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), পৃ. ৩৪।
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪ ।
৭৪. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা: ১৯৯৪, ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী), পৃ. ৬৫।
৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।
৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।
৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।
৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।
৮১. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা: ১৯৯৩), পৃ. ১৭।
৮২. *দীর্ঘ নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
৮৩. *মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩।
৮৪. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলিকাতা: ১৩৯৪ বাংলা), ২১৪।
৮৫. *ধর্মপদ/তৃষ্ণাবর্গ*/৩৩৮।
৮৬. *ধর্মপদ/তৃষ্ণাবর্গ*/৩৪০।
৮৭. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস* (কলিকাতা:১৯৮৯), পৃ. ৩১২।

৮৮. Vincent A Smith, Asoka-*The Buddhist Emperor of India*, Reprint (Delhi:2013, Low Price Publication), P. 210 .
৮৯. অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের, *প্রিয়দর্শী অশোক*, দ্বিতীয় প্রকাশ (চট্টগ্রাম:২০১৬), পৃ. ৩ ।
৯০. Vincent A Smith, *Asoka-The Buddhist Emperor of India*, Reprint (Delhi:2013, Low Price Publication), P. 210.
৯১. ibid, P. 204.
৯২. ibid P. 204.
৯৩. উদ্ধৃত, সুকোমল বড়ুয়া এবং সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০০, বাংলা একাডেমী), পৃ. ১৫৫ ।